– দ্বিতীয় অধ্যায় –

‘রহু চণ্ডালের হাড়’ ঃ উপনিবেশোত্তর অধ্যয়ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘রহু চণ্ডালের হাড়’ ঃ উপনিবেশোত্তর অধ্যয়ন।

ছোট পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করা লেখক অভিজিৎ সেন প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন তাঁর ‘রহুচণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসটি ১৯৯২ সালে বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার পর। তাই এই উপন্যাসটিকে লেখকের জীবনের একটি মাইলস্টোন হিসেবে ধরে নিলে তেমন ভুল হয় না, আর এজন্যেই লেখকের আখ্যানবিশ্ব পরিক্রমায় সর্বপ্রথম আলোচ্য রচনা হিসাবে এই উপন্যাসটিকে নির্বাচন করেছি। ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত এই উপন্যাসটির ব্যাখ্যা নানাভাবে হতে পারে। একদিকে উপন্যাসটি যেমন ভারতীয় সভ্যতার আদিপর্বে বিস্তারকামী আধিপত্যবাদী মানবগোষ্ঠীর দ্বারা আদিবাসী মানুষের উৎখাতপর্বের স্মৃতিবাহী অন্যদিকে তেমনি ভাষার মোচড়ে, রূপকাঢ্য-বিবৃতিতে উপন্যাসটি নয়া উপনিবেশবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতিকেও অনাবৃত করে। আসলে একুশ শতকে দাড়িয়ে কোন একটি পাঠকৃতির আলোচনাকে কেবলমাত্র তাঁর আখ্যান অংশের শিল্পগত মূল্যায়নের মধ্যেই সীমায়ত করে রাখা যায় না। কেননা বিগত দুই শতকে তত্ত্বের যে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে গেছে তা আমাদেরকে কোনো একটি পাঠকৃতিকে কেবলমাত্র তার কাহিনির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকতে দেয় না। তাই আজকে একটি সাধারণ রচনাও কখনও বিনির্মাণের, কখনও উত্তর আধুনিকতার, আবার কখনও উত্তর উপনিবেশিকতাবাদীতত্ত্বের আলোকে আলোচিত হয়ে লাভ করে অসাধারণত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহান সাহিত্যস্রষ্টা, যিনি একজন বিরল গোত্রের সাহিত্য সমালোচকও, তিনি মনে করতেন সাহিত্য সমালোচনার কাজ কেবল বিশ্লেষণ নয়, ব্যাখ্যাও। [১] অর্থাৎ ‘Interpretation rather than analysis’ ; আর ব্যাখ্যার জন্য দরকার চিন্তা। ‘I think therefore, I exist’- রনে ডেকার্তের ভাষ্যের সত্যতা এখানেই। ভাবনার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে

আমরা যেখানে পৌঁছাই তাই হলো জ্ঞান। যে জানতে চায় সে হলো সত্ত্বা, আর যা জানতে চায় তাই হল জগত। আর সত্ত্বা যার মধ্য দিয়ে জগতের নির্যাস গ্রহণ করতে পারে তাই হলো তত্ত্ব। তাই একটি পাঠকৃতির যথার্থ নির্যাস আহরণ করতে হলে তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার একান্ত প্রয়োজন। যদিও নির্দিষ্ট কোনো তাত্ত্বিক চিন্তাপ্রস্থানকে সাহিত্যিক রূপ দেবার জন্য কোনো লেখক গল্প উপন্যাস বা কবিতা লেখেন না,– কিন্তু যখন কেবল মানবিক অনুভূতিজাত এই শিল্পসৃষ্টিগুলো নানা তত্ত্বপ্রস্থানের আলোকে ব্যাখ্যাত হয় তখন এর আপাত সাধারণ বর্ণনাগুলিও এক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণরূপে হাজির হয়। তখনই মনে হয় মানবিক অনুভূতিও কেবল মননজাত বস্তু নয়, এর সাথেও তার সময়, সমাজ, পরিসর যুক্ত রয়েছে অঙ্গাঙ্গীভাবে। কিন্তু এই সময়, সমাজ ও পরিসরকে পরিলক্ষণ করার দৃষ্টি সকল লেখকের যে সমান হবে এমন নয়। বর্তমান সমযেও এমন লেখকেরা রয়েছেন যারা মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের কামপ্রেমের আখ্যান নির্মাণেই অধিক মনোযোগী। আবার এমন লেখকেরাও আছেন যারা এই পথে হাঁটতে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। এঁদের টান মাটির দিকে। উৎস পুনরুদ্ধারের আকুতিই এদের গ্রামকেন্দ্রিক গোষ্ঠীসভ্যতার দিকে ধাবিত করে এবং লোকজীবন ও সংস্কৃতিকে নতুন করে আবিস্কার করতে চান তারা। কালের বিচারে উভয় লেখককূলই সমকালীন, কিন্তু এদের চিন্তাচেতনায় দূরত্ব রয়েছে বিস্তর। প্রথম দলে যুক্তি তর্ক নির্ভর আধুনিকতা আছে, কিন্তু কোথাও যেন রয়ে গেছে, সীমাবদ্ধতা এই সীমাবদ্ধতা পুঁজিশাসিত, বাজার নিয়ন্ত্রিত, স্থিতাবস্থাপন্থী মনোভঙ্গির ফলশ্রুতি বলে চিহ্নিত করতে পারি। আবার অন্যদিকে এতদিনকার সমস্ত বানিয়ে তোলা ধারণাকে ভেঙে দিয়ে প্রতিকূলস্রোতের পথে এগোনোর এক চরম আকাঙ্খা লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয় বর্গের লেখক কূলের মাঝে। চিন্তার উপনিবেশ ভেঙে উপনিবেশোত্তর অবস্থানে এগিয়ে আসার এক প্রচেষ্টা রয়েছে এদের মধ্যে। অভিজিৎ সেন এই দ্বিতীয় বর্গের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আমাদের এই অধ্যায়ে লেখকের ‘রহুচণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসটিকে উপনিবেশোত্তর তাত্ত্বিক প্রস্থানের

আলোকে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েছি।

উপন্যাসটিকে উপনিবেশোত্তর তাত্ত্বিক চিন্তাপ্রস্থানের আলোকে আলোচনার আগে উপনিবেশোত্তর ভাবনাটি সম্পর্কে আমাদের একটু আলোকপাত করা দরকার। বিশ্ব সমালোচনা সাহিত্যের ধারাকে আলোচনা করলে এর মধ্যে তিনটি প্রধান বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো হলো– Traditional বা ঐতিহ্যগত, Structuralistic বা অবয়ববাদী, এবং Post-structuralistic বা উত্তর অবয়ববাদী। সত্তর এর দশকে বিকশিত এই উত্তর অবয়ববাদী ধারার একটি অন্যতম পর্যায় হল Post-colonialism বা উপনিবেশোত্তরবাদ। Post-colonial theory-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'Relocating our past' [২]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে যে স্বাধীনতা এলো, তার পরবর্তী সময়ে দেখা গেল এক নতুন আকাঙ্খা। নিজেদের উপনিবেশিক অতীতকে ভুলে যাবার আকাঙ্খা। কিন্তু এই অস্বস্তিকর বাস্তবের স্মৃতিকে ভুলে যাওয়াও যায় না। এই অবস্থারই প্রতিক্রিয়ায় এলো Post-colonial তত্ত্ব। উপনিবেশিক অতীতের রহস্যময় বিস্মরণের বিরুদ্ধে এ হলো এক তাত্ত্বিক প্রতিরোধ।

উপনিবেশোত্তর বা উত্তর-উপনিবেশবাদ এমন একটি জ্ঞান ও সংস্কৃতিঘেঁষা রাজনৈতিক দর্শন যার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চা থেকে উপনিবেশিকতা দূর করে নিজস্ব আত্মপরিচয় অর্জন করা। ঔপনিবেশিক প্রভুদের মদতে বিভিন্ন দেশ ও জাতির ভাবনায় যে নেতিবাচক চিন্তাপ্রস্থানের জন্ম হয়েছে তাকে চিহ্নিত তথা দূরীভূত করে আপন ঐতিহ্যসংলগ্ন জ্ঞানের অন্বেষণের কথা বলে উপনিবেশোত্তরবাদ। ঔপনিবেশিক শাসকপুষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা ও জ্ঞানচর্চার কারণে একশ্রেণির মানুষের দ্বারা অন্যশ্রেণির মানুষদের উপর যে শোষণ চালিত হয়, তা দূর করার প্রচেষ্টা নিয়েই উপনিবেশোত্তরবাদের যাত্রারম্ভ। ১৯৮০-র দশক থেকে এই তত্ত্ব-প্রস্থানটি লক্ষণীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে

রয়েছে Edward Said এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ORIENTALISM'। (1978) Edward W. Said মনে করতেন,

"We can not fight for our rights and our history as well as future until we are armed with weapons of criticism and dedicated consciousness." [৩]

অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো তাত্ত্বিক অবস্থান না থাকলে নিজস্ব অধিকার, ইতিহাস এবং সর্বোপরি ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলা লড়াইও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই লেখকের Orientalism ই উত্তর উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আমাদের এক স্পষ্ট ও সম্ভাবনাময় চিন্তা-চেতনা নির্মাণে প্রথম সাহায্য করে। উপনিবেশ যে কেবল একটি রাষ্ট্রে, আর একটি রাষ্ট্রের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক আগ্রাসন– এমন নয়, বরং আধিপত্যবাদী সমাজের প্রান্তবাসী গোষ্ঠীর ওপর সাংস্কৃতিক, মানসিক এবং সর্বোপরি বৌদ্ধিক আগ্রাসনও যে একধরণের ঔপনিবেশিকতা– এই ব্যাপারটি সাঈদ তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন বিশেষভাবে। একটি দেশ তার ঔপনিবেশিক সময় কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে– হতে পারে স্বাধীন, – কিন্তু তার মানসিক স্বাধীনতা তখনই সম্ভব যখন তার বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল যথার্থ অর্থে উত্তর-উপনিবেশিক অবস্থানে বিরাজ করতে সক্ষম হয়।

দীর্ঘ দুই শতক বাংলা পাশ্চাত্য উপনিবেশের অধীনে ছিল– তাই বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্যে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক। কিন্তু রাষ্ট্র যখন colony-র অধীনতা থেকে মুক্ত হলো– তখন দেখা গেল এই মুক্তি একেবারেই বাহ্যিকমননে উপনিবেশ জড়িয়ে গেছে পোক্তভাবে। বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়ে বাঙালি নিজেকে আধুনিক বলে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য, সংস্কৃতির অনুকরণের পথে হেঁটে। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ধারা বিকশিত হয়েছে পাশ্চাত্য

মডেলকে নকল করে। বাংলা কথাসাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারাটি আলোচনা করলে দেখা যাচ্ছে সেখানেও পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে ইউরোপীয় মডেল। মূলত এই মডেলের আদলে রচিত সাহিত্যই পাচ্ছে উপন্যাসের মর্যাদা। তাই প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' নয়, বরং বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'ই ঘোষিত হচ্ছে প্রথম বাংলা উপন্যাস রূপে। আর এভাবেই ইউরোপীয় মডেল বাংলা উপন্যাসকে তার সম্ভাব্য, আকাঙ্খিত, অভিপ্রেত ও যুক্তিযুক্ত পথ থেকে বিচ্যুত করছে– যদিও আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টার মর্যাদার সামনে এই সামান্য বিচ্যুতি– নেহাত অগ্রাহ্যের বিষয়।

''উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে'' প্রবন্ধগ্রন্থের নাম প্রবন্ধটিতে দেবেশ রায় ইউরোপীয় উপন্যাসের মডেলকে বোঝাতে গিয়ে চ্যাপলিনের 'দি কিড' ছবির একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছিলেন। চ্যাপলিনের এই ছবিতে বাচ্চা জ্যাকি কুগান ঢিল মেরে মেরে জানলার কাঁচ ভাঙে যাতে চ্যাপলিন এই কাঁচগুলো সারাতে পারে। জানলার কাঁচ সারানোর পেশায় সাফল্যের ওটা একটা চ্যাপলিনি কৌশল। একইভাবে ইউরোপীয় মডেল অনুসারী উপন্যাসগুলির সাফল্যের জন্য ঔপন্যাসিক কেবল একটি স্থিতাবস্থাকে ভেঙেই ক্ষান্ত হন না, একে নতুন ভাবে গড়ে নিয়ে পাঠকের প্রশংসাও কুড়াতে চান। ফলে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রোমান্সের ভাঙাগড়ার কাহিনিতেই সীমায়িত রয়ে যায় বাংলা উপন্যাসের ধারা। যদিও এই গতানুগতিকতার আড়ালে পড়ে যায় যথার্থ সমাজ বাস্তবতা, সময়ের বহুকৌনিকতা এবং সর্বোপরি এদেশীয় ঐতিহ্য।

সাধারণ মানুষ ছিল প্রাক্-উপনিবেশিক পর্বের আখ্যান সাহিত্যের মধ্যমণি। ভূমিলগ্ন মানুষই ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রধান কুশীলব। সেখানে উপনিবেশিক পর্বের আখ্যান সাহিত্য থেকে প্রান্তবাসী সাধারণ মানুষ চিরতরে বিদায় নিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখেরা 'সাম্য', 'বঙ্গদেশের কৃষক' কিংবা 'Peasantry of Bengal'

লিখলেন, অথচ উপন্যাসে কৃষক বা সাধারণ মানুষ তার যথার্থ বাস্তবিক অবস্থানের সত্যতা নিয়ে উঠে এল না। নাগরিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষই হলো উপন্যাসের আধেয়। সময়ের সাথে সাথে বিষয় বদলাল, চরিত্ররাও বদলাল, – কিন্তু চিন্তা চেতনায় তেমন বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না।

এমনই একটি প্রেক্ষাপটে আত্মপ্রকাশ করলেন দেবেশ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, অভিজিৎ সেন প্রমুখ লেখকেরা। তাঁদের ভাষ্য প্রকাশের মাধ্যম যদিও ছোট পত্রিকা, তবে তাঁদের চিন্তা-চেতনার বৃত্তটি কোনো অংশেই ছোট নয়। ঔপনিবেশিকতা প্রদত্ত আধুনিকতার বিপরীতে এক নতুন আধুনিকতার কথা বললেন তাঁরা। এই নতুন আধুনিকতায় সাহিত্য নির্মিত হবে colonizer দের মতানুযায়ী নয়, বরং colonized দের কেন্দ্রে রেখে। তারাই হবে কাহিনির একমাত্র এবং অনত্যম আধেয়। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'ধনপতির চর' এর কুন্ডী বাঘারু কিংবা রহু চণ্ডালের হাড় এর দনু বা পীতেম – সকলেই এই 'colonized' দলের অন্তর্ভুক্ত এবং এদের কেন্দ্র করেই এদের রচয়িতারা গড়ে তুলছেন তাদের সাহিত্যসৃষ্টি। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের ভূমিকায়ই লেখক ঘোষণা করেছেন, এই উপন্যাসটি মূলত – *"উত্তরবঙ্গের এক যাযাবর গোষ্ঠীর সংগ্রামের কাহিনি।"* [৪]

এখানেই লেখকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তার আধেয় উচ্চ মধ্যবিত্তের ব্যক্তিগত টানাপোড়েনের আখ্যান নয়, এটি একটি প্রান্তিকায়িত গোষ্ঠীর জীবন সংগ্রামের কাহিনি। 'যাযাবর', 'বাদিয়া', 'বাজিকর'– এই জাতির অবস্থান আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একেবারের নীচের তলায়। এদের স্থির কোনো ঠিকানা নেই। এরা আজ এখানে, কাল সেখানে। অন্নসংস্থানের হেতু স্থানে-স্থানে ঘুরে নানা ধরণের খেলা দেখিয়ে, জড়িবুটি বিক্রি করে, কখনও মানুষের অন্ধবিশ্বাসের ঔষধ বিক্রি করে চলে এরা। এদের শক্তি এদের গোষ্ঠীবদ্ধতায়। মূলত, মানব জাতির মূল ভিতই রচিত হয়েছিল গোষ্ঠীভিত্তিকতার

উপর নির্ভর করে। ধীরে ধীরে আমরা এই নৈর্ব্যক্তিক গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে আপন ব্যক্তিগত সমস্যায়ই নিজেদের জীবনকে সীমায়িত করে নিয়েছি। যাই হোক, এখানে লেখক সেই পূর্বতন গোষ্ঠীবদ্ধ একটি প্রান্তিকায়িত গোষ্ঠীকেই স্থাপিত করেছেন রচনার কেন্দ্রে। এখানেও লেখকের উৎস পুনরুদ্ধারের আকুতিকেই খুঁজে পাই উত্তর উপনিবেশিকতার চোখে তাকালে। মোট কথা, লেখকের অভিপ্রেত তথাকথিত আধুনিক উপন্যাসের ব্যক্তিসর্বস্বতা নয়, বরং সাধারণ মানুষের সামূহিক জীবনালেখ্য।

ঔপনিবেশিক পরিসরে সাহিত্যিকেরা চরিত্রের আঁতের কথা উদ্ধারের চেয়ে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক প্রতিবেদন নির্মাণেই অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁদের হাতে কোনো বাস্তব চরিত্র নির্মিত হলে তাতেও বাস্তবের চেয়ে কল্পনাই থাকত অধিক। অন্যদিকে অভিজিৎ সেনের মতো লেখকেরা প্রথমেই বললেন সাধারণ মানুষের কাহিনি তাদেরকে উপর থেকে দেখে লেখা সম্ভব নয়। দেখতে হবে তাদের মতো করে। তাদের একজন হয়ে। তাঁরা বললেন- 'to write about the other' এর বদলে– 'to write as the other' এর কথা। 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের চরিত্ররাও যে কল্পিত নয়, বরং লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার সার্থক রূপ তার প্রমাণ পাই লেখকেরই বয়ানে –

"১৯৭৩ - ১৯৭৪ সালে একবছর তিনচার মাস সময়ের জন্য আমি তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরের একটি সমবায় ব্যাংকে চাকরি করেছিলাম। সেই সময় বালুরঘাট মহকুমার তপন থানার কয়েকটি গ্রামে এই বাজিকরদের সঙ্গে আমার দেখা হয়। মাঝখানে কয়েক বছর বাদ দিয়ে ১৯৭৬-১৯৭৭ সাল থেকে ফের বাজিকরদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল আমার। বেশ কয়েকবছর এদের কাছ থেকে এবং দূর থেকে দেখার পুঁজি সম্বল করে 'রহুচণ্ডালের হাড়' লেখার কাজ শুরু করি খুব সম্ভবত ১৯৮০ সালের কোন এক সময়।" [৫]

এখানে লক্ষ করি লেখক কোনো আলাদা ব্যক্তি নন, যিনি দূর থেকে সহমর্মিতার সঙ্গে এই বাজিকরদের দেখছেন। তিনি এদের মধ্যে থেকেই এদের বাস্তবিক জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলিকে অবলোকন করছেন, তাই তার ন্যারেশনেও এই ডিটেলড্ বিষয়গুলি উঠে আসছে খুব স্বাভাবিকভাবে।

সমাজবাস্তবতার এই স্বাভাবিক উপস্থিতিই উত্তর উপনিবেশিক সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। ঔপনিবেশিকতার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আক্ষরিক অর্থেই সমাজ বহির্গত, প্রতিষ্ঠান বহির্ভুত মানুষদেরকে নিয়ে তৈরি লেখকের এই উপন্যাসটিতে বাজিকরদের সেই ইতিহাস উঠে আসছে যেখানে প্রায় দেড়শ বছর ধরে একদল যাযাবর সমাজের অভ্যন্তরে পুনর্বাসিত হওয়ার চেষ্টা করছে আর বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। এই চেষ্টার মর্মান্তিকতাকে তাদেরই একজন হয়ে উপলব্ধি করেছেন লেখক, আর ক্ষমতাশীল শক্তির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত প্রান্তিক 'অপর' এর তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুভব অনুভূতিকে তুলে ধরেছেন তাঁর বয়ানে। সেই যে আধিপত্যবাদীদের চাপে বাজিকরেরা অচ্ছ্যুৎ হলো, তারপর যুগযুগ ধরে তারা ব্রাত্য হয়েই রইলো। কিন্তু এর বিরুদ্ধে তাদের বলার কিছু নেই, কারণ তারা জেনে এসেছে, তাদের জানানো হয়েছে,– তাদের নিজেদের পাপের পরিণামেই তাদের এই দুরবস্থা। কিন্তু কী এই পাপ? কি ছিল দেবতার অভিশাপ? উপন্যাসের বয়ানেই উঠে আসে সেই ইতিহাস –

"হাজার বছর আগে যখন কোনো এক বিশাল নদীর ধারে স্থায়ী বসবাস করত, সেই সময়কার পৌরাণিক স্মৃতি তাদের ভারাক্রান্ত করত। যখন তাদের কোনো প্রাচীন পুরুষ পুরা এক নর্তকীর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। তারপর শুরু হয় সেই অন্তর্কলহ, যা তাদের স্থায়ী বসবাসকে ছিন্নভিন্ন করে। মানুষ তখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরার বিরুদ্ধবাদীরা দাবি তুলেছিল, এ বিয়ে হতে পারে না, কেননা পালি নামের সেই নর্তকী নাকি তার বোন। সুতরাং এ বিয়ে হবে অসামাজিক

এবং অমঙ্গলময়।

পুরার সমর্থকরা বলেছিল, এ বিয়ে হবেই, কেননা পালি যে পুরার বোন এর কোন প্রমাণ নেই।

তারপর পুরা ও পালির বিয়ে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিশাপ নেমে আসে তাদের উপর। অন্তর্কলহে সমস্ত সমাজ নষ্ট হয়। পুরা ও পালি দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। তারা কোথাও আশ্রয় পায় না এবং দেবতা তাদের অভিশাপ দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় করে দেয়। তোমরা এক বৃক্ষের ফল দু-বার খেতে পারবে না, এক জলাশয়ের জল দু-বার পান করতে পারবে না, এক আচ্ছাদনের নিচে একাধিক রাত্রি বাস করতে পারবে না এবং সব থেকে ভয়ানক– এক মৃত্তিকায় দু-বার নৃত্য করা দূরে থাকুক, দু-বার পদপাদ পর্যন্ত করতে পারবে না। এই ছিল দেবতার অভিশাপ।'' [৬]

এই অভিশাপ বা পাপের মিথকেই প্রশ্নহীন আনুগত্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মেনে এসেছে দনু-পীতেম-সালমা-লুবিনিরা। তাই দীর্ঘকালের প্রণয়ে আবদ্ধ থেকেও পীতেম ও সালমা পরিণয় বন্ধনে একে অপরকে গ্রহণ করে নিতে পারে নি। পীতেম ও সালমা উভয়ের পিতা এক হওয়ার সম্ভাবনা ওদেরকে পৃথক রেখেছে, তাড়িত করেছে পিতৃপুরুষের পাপের myth, কিন্তু বাস্তবে এই পাপের myth যে আসলে 'other' বা 'অপর' নির্মাণের একটা কৌশল এই ব্যাপারটিরও আভাস মিলেছে উপন্যাসের পাতায়ই। তাই বারেবারেই শারিবা এই পিতৃপুরুষের পাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যদিও সদুত্তর মেলেনি নানি লুবিনির কাছ থেকে, পক্ষান্তরে তাকে ঘুম পাড়ানোই উচিৎ বলে মনে করেছে লুবিনি। কেননা এতকাল ধরে সে জেনে এসেছে, এই ধরণের প্রশ্ন তুলতে নেই, মেনে নিতে হয়। এই মেনে নেওয়ার বাধকতা তৈরি করে যে প্রক্রিয়া– তারই নাম ঔপনিবেশিকতা। কিন্তু শুধু ঔপনিবেশিক কাঠামো তৈরি করাই উদ্দেশ্য নয়

আমাদের লেখকের, বরং এই কাঠামো ভেঙে উপনিবেশোত্তর চিন্তার পথের সম্ভাবনা দেওয়াই তার লক্ষ্য। তাই লেখক বলছেন, –

"পীতেম কিংবা সালমা কেউ জানবে না তাদের পরবর্তী তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষেই বিষয়টি নিয়মে পরিণত হবে বাধ্য হয়ে, সে বাধকতায় পুরা ও পালি আনীত অভিশাপ মূল্যহীন হয়ে যাবে।'' [৭]

যখন অন্নসংস্থানই সর্বপ্রধান সমাধানহীন সমস্যার স্তরে পৌঁছায় এবং সমাজ বহিষ্কৃত জাতি আপন অস্তিত্বের সংকটে দিশাহারা হয়ে যায়,– তখন সমস্ত তৈরি করা মিথ মূল্যহীন হয়ে যায়। তাই যখন লুবিনি শারিবাকে স্বপ্ন দেখায় স্বর্গে যাওয়ার, বলে সেখানে খাদ্যের অভাব নেই,– তখন শারিবা এই মেনে নেওয়ার বাধকতা ভাঙতে চেষ্টা করে। লুবিনি যখন বাজিকরের স্থিতি, শান্তিলাভের সম্ভাবনা শুধুমাত্র মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভের মধ্যেই সম্ভব বলে জানান, তখন শারিবা যা বলে তা *"..... কোন দিন আর কোন বাজিকর বাউদিয়া বলেনি।''* [৮] আর এখানেই উপনিবেশিকতার আবদ্ধতা পেরিয়ে উপনিবেশোত্তরের পথে যাত্রা করেন লেখক। শারিবা বলে–

"তবি হামার ওঠি যাবার দরকার নাই, নানি। মরার পর হামার অঢেল খাবার খায়্যে কি হোবে?'' [৯]

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র পাপ পূণ্য স্বর্গ নরক ইত্যাদি বয়ান তৈরি করে বিস্তার করে উপনিবেশ। বিনা প্রশ্নে তা মেনে না নিয়ে প্রান্তিকায়িত অপর পাল্টা প্রশ্ন তোলে। এই প্রশ্নই উপনিবেশিকতার বানিয়ে তোলা বয়ানের বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদ।

উপন্যাসে নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে উপনিবেশিক প্রভুদের দ্বারা প্রান্তিকায়িতের ওপর শোষণের চিত্র উঠে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ ধন্দুর আদরের ঘোড়াটিকে যখন দারোগা জোর করে ছিনিয়ে নেয়, তখন বালির বয়ানে উঠে আসা একটি বক্তব্য বিশেষ দ্রষ্টব্য, যেখানে পীতেম বলে যে তার বাপ তাকে বলেছিল দুনিয়ার

সব মাঠে চরা জানোয়ারদের ওপর বাজিকরদের অধিকার, কেননা এই পশুদের নিয়েই তাদের জীবন, তাদের জীবিকা,– তখন বালি বলে ওঠে, –

"কিন্তু তার মধ্যে ভালোটা দারোগার।" [১০]

দারোগা অর্থাৎ আধিপত্যবাদী প্রভুর অধিকার সর্বশ্রেষ্ঠ জানোয়ারটির ওপর। এই অধিকার তাকে দিয়েছে আমাদের ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে পারে না বালি না দনু বা পীতেম, কিন্তু ঘোড়াটি প্রতিবাদ করতে চায়। পিঠ থেকে সজোরে উৎখাত করে দারোগাকে, কিন্তু আধিপত্যবাদী শক্তির প্রবল চাবুকের আঘাতে সেই প্রতিবাদ টিকতে পারে না। ফলে পরিণতিতে করুণ আত্মসমর্পণ।

এই ক্ষমতার শক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে আরেকটি বিষয়ও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসের একটি স্থানে সাঁওতাল আদিবাসী সমাজের সাথে বাজিয়াদের একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা তুলে এনেছেন লেখক। সাঁওতাল ও বাদিয়া– উভয়েই শোষিত, উভয়েই colonized, কিন্তু এই শোষণের পরিসংখ্যান বা উপলব্ধি যতটা স্পষ্ট বাদিয়াদের কাছে, সাঁওতালদের কাছে ততটা নয়। আদিবাসী সাঁওতালদের সরলতার সুবিধা নিয়ে তাদের ঠকানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু মাথাপেতে শুধু মেনে নিতে হয় এসব। আধিপত্যবাদী সমাজ এভাবেই প্রশ্নবিহীন আনুগত্য অর্জন করে। লুবিনিরা এই বয়ানকেই পাল্টা আঘাত করে। উপনিবেশোত্তর শুধু উপনিবেশের সমালোচনা না, সমস্ত পর্যায়ে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রান্তিক পরিসরের প্রতিরোধ রচনাই তার চরিত্র। উপন্যাসে দেখি, 'ঠকে যাওয়ার' উপলব্ধি এখনও তেমনভাতে গড়ে ওঠে নি তাদের মধ্যে। তাই–

"যে যেমনভাবে পারে এই জটিলতাবর্জিত হড়কে বুঝ দিচ্ছে, তা ওজনে হোক কিংবা পয়সায় হোক। আর কী আশ্চর্য, এরা বুঝে যাচ্ছে, মেনে নিচ্ছে, খুব যে অখুশি তাও মনে হচ্ছে না।" [১১]

তাদের এই সরলতার সুযোগ বুঝেই তাদের সমগোত্রীয় বাজিকরেরাও মতলব আঁটছে তাদের ঠকানোর। তামা-পেতল-রাঙ এর চকচকে গহনা তাদের কাছে বেঁচে অর্জন করে নিচ্ছে অধিক খাদ্য শস্য এবং তৈলবীজ যা আবার গোলাদারকে বিক্রি করে নগদ টাকা আদায় করে নিচ্ছে। এভাবেই ক্ষমতার জ্যামিতিতে স্থান পরিবর্তিত হচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের। আধিপত্যবাদের শোষণে ক্লিষ্ট বাদিয়া সুযোগ পেয়ে নিজেই স্থাপন করতে চাইছে আপাত দুর্বলের ওপর। এটাই আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশিক রাজনীতির চরম সত্য।

প্রাতিষ্ঠানিক উপন্যাসবৃত্তের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসায় প্রয়াস করেছিলেন অভিজিৎ সেন এর মত লেখকেরা। তাঁদের এই বেরিয়ে আসার প্রয়াস ছিল সর্বাঙ্গীন। তাই উপন্যাসের বিষয়ই হোক, আর বাচনভঙ্গির বিন্যাস সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা পাশ্চাত্য আশ্রিত বাংলা উপন্যাসের মডেল থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন। প্রান্তিকায়িতের কথা যথার্থ বাস্তবিক রূপে সাহিত্যে তুলে ধরতে গেলে প্রান্তিক মানুষের মুখের আকাড়া ভাষাকেই নিয়ে আসতে হবে সাহিত্যের ভাষা রূপে– এমনই মতামত ছিল এই উত্তর উপনিবেশিক অবস্থানে স্থিত লেখকদের। যদিও এতদিন ধরে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাহিত্যিকদের চরিত্রমণ্ডলীর বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলেরই হোন না কেন, কথা বলেছেন একেবারে শুদ্ধ নাগরিক ভাষায়। তাঁদের রচনায় কোনো আঞ্চলিক ভাষায় প্রভাব লক্ষ করা যায় নি। কারণ সম্ভবত সাহিত্যের মান ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা। কেননা ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে ভাষার standardization এত দিনে হয়ে গেছে। মান্য ভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই উপনিবেশিকতার ইতিহাস জানতে গেলে আমাদের বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নের দিকে আলোকপাত করতে হয়। মূলত পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকেই আমাদের উপন্যাসের জ্ঞান। এর আগে বাঙালি সম্ভবত জানত না (!) উপন্যাস কাকে বলে, লিরিক কাকে বলে, ট্র্যাজেডি কমেডি কি। ইউরোপের উপনিবেশ নির্মাতারা আমাদের শেখালেন দেশের অর্থনীতি বলতে বোঝায়

শিল্প, শাসন বলতে বোঝায় গণতন্ত্র, দেশের শিল্প সাহিত্য বলতে বোঝায় লিরিক ট্র্যাজেডি-কমেডি, নভেল বা উপন্যাস। এই উপনিবেশিক জ্ঞান আমাদেরকে ঐতিহ্য ভুলে প্রভুদের সবকিছু নির্বিবাদে গ্রহণ করার মন্ত্র শেখালো। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতেই বিবেচিত হতে লাগলো সমস্ত সাহিত্য। তাই 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' নয়, 'দুর্গেশনন্দিনী' ই পেল প্রথম সার্থক উপন্যাসের ও বঙ্কিমচন্দ্র পেলেন প্রথম সার্থক উপন্যাসিকের মর্যাদা। বঙ্কিম মূলত ইউরোপীয় মডেলকে অনুসরণ করেই তাঁর উপন্যাস রচনার যাত্রা শুধু করেছিলেন। তাই এদেশীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকতা, মানুষ ও মানব জীবনের যথাযথ রূপটি তাঁর রচনায় উঠে আসতে পারলো না। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি বঙ্কিম যখন 'রাজসিংহ' উপন্যাস লিখলেন জেম্‌স টডের 'Annals and antiquities of Rajasthan' থেকে রসদ সংগ্রহ করে, তখন উপন্যাসের কোনও চরিত্রের মুখে রাজস্থানী ভাষা বা চরিত্রে রাজস্থানী সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ করা গেল না। দেখা গেল চরিত্ররা কথা বলছেন বিশুদ্ধ সাধুভাষায়। এটাই প্রমাণ যে এতদিনে আমরা অর্থাৎ তথাকথিত আধুনিক মানুষেরা ইউরোপীয় উপন্যাসের বানিয়ে তোলা Model কে আশ্রয় এবং স্বীকার করে নিয়েছি সম্পূর্ণভাবে। এ বিষয়ে, চমৎকার আলোচনা করেছেন লেখক দেবেশ রায় তাঁর 'উপন্যাস নিয়ে', 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, নামের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলিতে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ইউরোপীয় উপন্যাস ভাবনা বাংলা উপন্যাসকে তার সম্ভাব্য, আকাঙ্খিত, অভিপ্রেত ও যুক্তিযুক্ত পথ থেকে বিচ্যুত করে রেখেছে। যার ফলে আমাদের সমাজ, মানুষ ও তার প্রকৃত জীবন চিত্র, তার মুখের প্রকৃত ভাষা উঠে আসতে পারছে না আমাদের আধুনিক উপন্যাসে। এই চাপিয়ে দেওয়া উপন্যাস ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস করলেন ঔপনিবেশোত্তর ভাবনায় ভাবিত লেখকরা। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে কোনো ধরণের ঔপনিবেশিকতা মানতে রাজী হলেন না দেবেশ রায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেনের মত সাহিত্যিকেরা। তাঁরা বললেন

কোনো কাঠামোর মধ্যে সাহিত্যকে আবদ্ধ করা চলবে না। সাধারণ, প্রাকৃত লোকজীবনের যে ভাষাকে slang বলে এতদিন নাক সিঁটকোতেন তথাকথিত সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকেরা, সেই ভাষাকেই একেবারে অবিকল তুলে আনলেন অভিজিতেরা তাঁদের বিভিন্ন চরিত্রের মুখে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে ভায়রোর সাথে শারিবার কথোপকথনের খানিকটা অংশ –

"ভায়রো গর্জন করে ওঠে। যেন বাঘের সামনে শারিবা, যেন বুদ্ধি নষ্ট শারিবার। সে স্থির হবার চেষ্টা করে। ভায়রোর চোখের দিকে তাকায় চোখ তোলে। চোখ নামায়।

খোঁজ পাই নাই, মালিক। শারিবা কথাটা বলে, একটু সাহস ফিরে পায় যেন। একটু দম নেয়, তারপর আবার বলে, কেন্তু খোঁজ পালেও মুশকিল, মালিক। আজুরা মণ্ডল টাকা দিবার রাজি হচ্ছে নাই।

হা - রা - ম - জা - দা

ভায়রো চুলের মুঠি ধরে শারিবার। মাটি থেকে টেনে শূন্যে ওঠাতে চায় যেন।

হারামজাদা, মিছা কথা হামার কাছে''। [১২]

এক বাজিকর যুবকের মুখে তারই পরিমণ্ডলের বাস্তব, উপরের স্তরের এক ব্যক্তির এই ভাষ্য এখানে যতটা বাস্তব রূপ পেয়েছে তথাকথিত standard ভাষায় তা কখনোই সম্ভব ছিল না। এভাবেই অভিজিৎ সেনের মত লেখকেরা উপনিবেশোত্তর ভাবনায় নিজেদের সমৃদ্ধ করে গড়ে তুললেন এক নতুন রচনারীতি যেখানে কোনো মানুষ, কোনো ঘটনা কোনো ভাষাই ব্রাত্য নয়,– সবই সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার জন্য উপযোগী। অভিজিৎ সেনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অঞ্জন সেন যখন লেখকের ব্যক্তিগত মতামত জানতে গিয়ে প্রশ্ন করেন –

"উত্তর উপনিবেশিক উপন্যাসে উপভাষা ও আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার একটি বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবহার আগেও ছিল, ধরুন তারাশঙ্কর বা মানিকবাবুর উপন্যাসে। তাঁদের

সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আপনাদের চিন্তাগত পার্থক্য রয়েছে। এই শৈলী কি আপনি ভেবে চিন্তে ভাষা দিয়ে পরীক্ষা করতে তৈরি বা নির্মাণ করেছেন, না স্বাভাবিকভাবেই রচনায় চলে এসেছে?'' [১৩]

তখন লেখক অভিজিৎ সেন যা উত্তর দেন তা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ভাষার এই মৌখিক রূপের শিল্পায়ন কোন গভীর চিন্তার ফসল নয়। এটিই স্বাভাবিক। তিনি বলেন–

"মুখের কথা আর লেখার ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যতদূর এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, মানিকবাবু সম্ভবত তাঁর একটি মাত্র উপন্যাসেই (পদ্মানদীর মাঝি) আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। তারাশঙ্করবাবু যদিও ব্যাপকভাবেই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে ধ্রুপদী শৈলীরই পক্ষপাতী। তাঁর উপন্যাসে উচ্চবর্গীয় মানুষ শুদ্ধ অর্থাৎ মান বাংলায় কথা বলে, নিম্নবর্গীয়রা আঞ্চলিক বা উপভাষায়। পরবর্তীকালে অনেকেই এই ধ্রুপদী রীতি ত্যাগ করে ভাষাকে আরো জীবন্ত করার জন্য আখ্যানের বর্ণনা অংশেও আঞ্চলিক ভাষা, এমনকি উপভাষাও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। আমি নিজেও অনেক লেখায় এই রীতি অনুসরণ করেছি। সচেতন কিংবা অচেতনের প্রশ্ন এখানে গৌণ। আসলে বিষয় এরকম দাবি করেছে বলেই আমাদের উপন্যাসে এমন হয়েছে। তবে খুব ভেবে চিন্তে এমন শৈলী তৈরি করি নি। স্বাভাবিকভাবেই ভাষা এমন হয়ে উঠেছে'' [১৪]

শুধুমাত্র ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, বিষয় নির্ধারণ ও রচনারীতির দিক থেকেও লেখক উপনিবেশের আরোপিত পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আমার চেষ্টা করেছেন। যেখানে এতদিন ধরে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য পাশ্চাত্য আশ্রিত মডেল তথা বিষয়বস্তুকেই যথাযোগ্য বিবেচনা করে চলে আসছিল। আমাদের আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের সিংহভাগ রচয়িতা পাশ্চাত্য অনুকরণে এতটাই নিমগ্ন হয়ে গেছিলেন যে তাঁরা ভুলে

গেছিলেন ব্রতকথা, পাঁচালি, কথকতা, কীর্তন ইত্যাদিতে আমাদের একটা কাহিনির ধরন বহুকাল আগে থেকেই বর্তমান ছিল। এই কাহিনিগুলো সময়ের সাথে সাথে কথকঠাকুর, পাঁচলিকারদের মুখে মুখে অদ্ভুতভাবে বদলে যেত। ফলে প্রতিটি সময় যুক্ত হতো সাহিত্যের পরিসবে। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রভাবে এগুলোর প্রচলন ক্রমশ কমতে থাকে। কারণ ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ দেশজ-লোকজ সাহিত্যিক উপাদানের চেয়ে পাশ্চাত্য বিষয় ও মডেলের দ্বারাই প্রভাবিত হতে থাকে। যার ফলে বাংলা আধুনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা অনেকটা উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তের কাম প্রেমের আখ্যান, কয়েকটা মনস্তাত্বিক সংলাপ ও কিছু জটিল শব্দবন্ধের মধ্যে আটকে যায়। আর এজাতীয় সাহিত্যই ঘোষিত তথা গৃহীত হয় মূলস্রোতের সাহিত্যরূপে। কিন্তু অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্রের মত সাহিত্যিকেরা এই দেশ- কালের বাস্তব পটপ্রেক্ষিতের সাথে নিঃসম্পর্কিত সাহিত্যধারা যেখানের সমাজের সাধারণ মানুষ প্রায় অনুপস্থিত, একে যথার্থ বলে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁদের কাছে ধরা পড়ে গেল সেই ক্ষমতার রাজনীতি, যেখানে প্রতিষ্ঠান চায় না সাধারণ মানুষ সাহিত্যভাত হোক। সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের এই ঔপনিবেশিকতার বিপরীতে দাড়িয়েই তাঁরা ঘোষণা করেন–

"এক দশক জুড়ে সারা উপমহাদেশ জুড়ে মানবতার অবিশ্রাম কান্না-হাহাকারগুলিকে নিপুন বধিরতায় বেমালুম এড়িয়ে গিয়ে, স্রেফ প্রেম কামের গল্প লিখে শেষ হয়ে গেল, দু-দুটো দশক! আর দেখো, এই সব গল্পের অধিকাংশই নাগরিক মধ্যবিত্তর গল্প, তখন বঙ্গদেশের কথাশিল্পের মানচিত্র থেকে গ্রামবাংলা পুরোপুরি উধাও। আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের মতো বিশাল গ্রামটিতে বসে গ্রামের গল্প না লিখলে লেখকের কলমশুদ্ধি হয় না।" [১৫]

বস্তুত এই ভাবনা উৎস থেকেই ঔপনিবেশিকতার গণ্ডি ভেঙে উপনিবেশোত্তরের পথে যাত্রা করলেন এই লেখকেরা।

অভিজিৎ সেন বলেছিলেন, বাংলা গদ্যের ঐতিহ্যে সেই মালমশলা অনুপস্থিত যা দিয়ে আধুনিক উপন্যাস লেখা যেতে পারে। তাঁর কাছে উপন্যাস হলো সেই প্রতিবেদন যা পটধৃত মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর মতে, সমাজ, সংস্কৃতি ও জায়মান ইতিহাসের পটে মানুষকে, তার ব্যক্তি ও সামুহিক জীবনের সমস্যা সঙ্কট উত্তরণের প্রয়াসকে তুলে ধরা, বোঝার চেষ্টা করা - এ হলো আধুনিক উপন্যাসের দায়। অর্থাৎ মধ্যবিত্তমেদুর বাংলা উপন্যাসের মতো আত্মরতির পৌনপুনিকতাই কেবল কাম্য নয়। দেবেশ রায়ের সতো এই কথাশিল্পীও উপন্যাসের প্রতীচ্য আহৃত মডেল বাংলার বহুস্বরিক জীবনাবস্থাকে ধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে মনে করেন। [১৬] তাই বাংলা উপন্যাসের যথার্থ মুক্তির উদ্দেশ্যে অভিজিৎ সন্ধান করেন নতুন পথের, কথাবয়নের নতুন রীতির যা হবে সকল প্রকার ঔপনিবেশিকতা মুক্ত। বিষয়বোধ ও বর্ণনারীতির ক্ষেত্রে উপন্যাসের এই মুক্তির সন্ধানে কেবল প্রান্তিকায়িতের পরিসরেই যান না অভিজিৎ, - লোককথা-মিথ-কিংবদন্তী-মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেশজ আখ্যান বয়নের যে পরম্পরা- সেই পরম্পরা কেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান চিন্তার উপনিবেশ মুক্তির উদ্দেশ্যে। এই প্রয়াসের মাধ্যমে বাস্তব ও রূপকের যুগলবন্দীতে আধুনিক বাস্তবতার 'শ্বাসরুদ্ধকর' পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে কুহক বাস্তবতার এক সার্থক সম্ভাবনাকেও উন্মেচিত করেন আর এখানেই লেখকের সাহিত্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের সাথে। উভয়ের এই চিন্তা-চেতনার সারূপ্যের পেছনে সম্ভবত ক্রিয়াশীল উভয়ের সামাজিক অবস্থান। মার্কেজের মতো অভিজিৎও ঔপনিবেশিকতা কে কেবল শোনেন নি উপলব্ধি করেছেন বাস্তবে। উভয়েই চেয়েছিলেন এই ঔপনিবেশিকতার বাঁধন ছিন্ন করে বেরোতে। সোচ্চার প্রতিবাদ উভয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নি - তাই তাঁরা কুহককেই বেছে নিয়েছিরেন প্রতিবাদের ভাষ্য রূপে। এই প্রসঙ্গে আরেকজন সাহিত্যিকের কথা স্মরণ করা যায়। তিনি হলে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে উপনিবেশোত্তর ভাবনার এক অদ্ভুত রূপ এঁকেছেন magic realism বা জাদুবাস্তবতার সাহায্যে, যেখানে নানা ঘটনাবলী ও চরিত্রের মধ্যে আপাত অবাস্তব কার্যকলাপ তথা বয়ান মিশিয়ে এক চরম বাস্তব সমস্যার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন লেখক। উপন্যাসটিতে ব্যাঙ্গের মোড়কে ঔপনিবেশিক প্রভুদের যথেচ্ছাচারকে আঘাতও করার প্রয়াস চালিয়েছেন তিনি। কিন্তু অভিজিৎ সেন তাঁর রচনায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে উপনিবেশিক কাঠামোর সমালোচনা করতে প্রয়াসী হন নি কিন্তু সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে উন্মোচিত করেছেন, যেখানে জাদু বাস্তবতা কোন আরোপিত বিষয় নয়, বরং জাদু যথার্থই বাস্তবের একটি অঙ্গ। ঔপনিবেশিকতা প্রদত্ত আধুনিকতার বিপরীত দাঁড়িয়ে এই নতুন আধিবাস্তবতাকেই আধেয় করে এক নতুন আধুনিকতা নির্মাণের কথা বলেন অভিজিৎ। কেননা তাঁর মনে এই নতুন আধুনিকতার সাথে যুক্ত হয়ে আছে অপরিচিত এক রহস্যের সৌন্দর্য। আর তাই তিনি মনে করেন,-

"ইউরোপীয় বুদ্ধি এবং মনস্তত্ত্ব চর্চার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমের ক্লান্তিকর কসরতের অনুসরণের বদলে আমাদের সাহিত্যিক মুক্তি বোধহয় ওই পথেই সম্ভব হ'তে পারে।" [১৭]

তাই তাঁর 'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে দীর্ঘ দেড়শো বছর ধরে বাজিকর সমাজ বেঁচে থাকে রহু চণ্ডালের 'হাড়' এর বিশ্বাসকে বুকে নিয়ে, পিতৃপুরুষের 'অভিশাপ' কে মেনে নিয়ে, 'পূবের দেশে' ফিরে যাওয়ার বাসনা নিয়ে। এই বিশ্বাস, এই কু-সংস্কার, এই বাসনাই যথার্থ সত্য। যা অস্বীকার করা কোন ভাবেই সম্ভব না। কিন্তু ঔপনিবেশিক চেতনাপুষ্ট মূলস্রোতের আধুনিক সাহিত্যে এ-সমস্ত বুজরুকির কোনো স্থান নেই। তাহলে লেখক কেন এই ভিন্ন পথের পথিক। কেন অন্যদের সাথে তাঁর এই ভিন্নতা? কেবলই কি চলতি স্রোতের বিপরীতে হেঁটে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা? উত্তর পাই লেখকের

নিজের জবানিতে-

"আমি যে খুব সচেতনভাবে পঞ্চাশ ষাটের ছক থেকে বেরিয়ে এসেছি (যদি এমন সত্যিই হয়), এমন মনে করি না। তবে পুরনো ফর্মুলা থেকে বেরিয়ে আসার একটা চেষ্টা তো সব সচেতন লোকের মধ্যেই থাকে।'' [১৮]

এই সচেতনতার খাতিরেই তিনি বিকল্প পথের দিশারী। লেখক স্বীকার করেছেন যে তিনি এতদিনকার প্রচলিত কথাসাহিত্যের ছক থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাহলে কি তিনি স্বীকার করছেন যে তিনি উপনিবেশোত্তর অবস্থানে দাড়িয়েই তাঁর উপন্যাস সমূহ রচনা করছেন। প্রাগুক্ত সাক্ষাৎকারে অঞ্জন সেন যখন লেখক অভিজিতকে প্রশ্ন করেন-

"বাংলায় আপনি যে ধরনের উপন্যাস লিখেছেন তাকে উত্তর-ঔপনিবেশিক নতুন উপন্যাস বলতে পারি কি?'' [১৯]

তখন অভিজিৎ সেন যে উত্তর দেন তা থেকেই তাঁর চিন্তাপ্রস্থানের সঠিক অবস্থান বুঝে নেওয়া যায়

"আমার সাহিত্যিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে- গ্রাম, নগর এবং মহানগর এই তিন অবস্থানেই আমার অভিজ্ঞতা বেশ ব্যাপক। আমার জন্ম এবং শৈশব কেটেছে পূর্ববাংলার এক গ্রামে। কৈশোর এবং যৌবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে কলকাতার মত মহানগরীতে। পরবর্তী জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে উত্তর বাংলার ছোট শহরে ও গ্রামে। আমি পশ্চিম বাংলার জেলাগুলোর বেশ কয়েকটি শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসও করেছি। এইসব জায়গার সমাজ, সংস্কৃতি, উন্নয়ন প্রশাসন এবং রাজনীতির মধ্যে নানা ভূমিকার জড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য আমার দুই-ই ব্যাপকভাবে হয়েছে। ফলে, যাকে আপনি 'ইউরো-আমেরিকান বিন্যাস' বলেছেন, তার বাইরের জীবনযাত্রার বিন্যাস আমার চোখে ধরা পড়েছে।

আমি এসব বিষয় ও সেই বিষয় আশ্রিত যোগ্য আঙ্গিকটিকেই আমার কিছু গল্প

উপন্যাসে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। আপনি যদি সে সব গল্প উপন্যাসকে "উত্তর-উপনিবেশিক নতুন উপন্যাস'' এই অভিধায় চিহ্নিত করতে চান আমার আপত্তি নেই।'' [২০]

অর্থাৎ লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁকে উত্তর-উপনিবেশিক অবস্থানে প্রতিস্থাপিত করেছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে বালুরঘাটে যে বাজিকরদের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল তাঁদের বিশ্বাস, 'রহু চণ্ডালের হাড়' এর রচয়িতাকে ভাবিয়েছে। যে বিশ্বাসকে বয়ে নিয়ে আসছে বেদিয়া যাযাবরেরা পুরুষের পর পুরুষ ধরে সেই বিশ্বাস শত আঘাত, শত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও ভেঙে যায় না। সেই বিশ্বাসকে নিয়েই আবার নতুন করে বাঁচে এক - এক প্রজন্মের একেক জন। এই বিশ্বাস, এই 'রহু চণ্ডালের হাড়' এর দীর্ঘ ইতিহাসকে কেবল আধুনিক হয়েছি বলেই অস্বীকার করব– এটা মানতে রাজী হন নি লেখক। লোকবিশ্বাসের এই ইতিহাস থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমরা আধুনিক ব্যক্তিজীবনে যে আখ্যান বেছে নিচ্ছি তাতে যথার্থ সমাজ বাস্তবের সর্বাঙ্গীন উপস্থিতি সম্ভব হচ্ছে না বলেই তিনি মনে করেন।

'রহু চণ্ডালের হাড়' এ বেদিয়া যাযাবরদের যে ইতিহাস তা যেন এক অক্লান্ত সংঘর্ষের ইতিহাস। যে সংঘর্ষ তথাকথিত নিম্নশ্রেণির সঙ্গে আধিপত্যবাদী শ্রেণির, বা বলা ভালো শোষিতের সাথে শাসকের। এই সংঘর্ষের কোনো বিরাম নেই, নেই সমাপ্তির আশাও। কেননা এই আধিপত্যবাদী প্রভুরা বারেবারেই এই যাযাবরজাতিকে অহেতুক সমস্যার সামনে দাঁড় করাচ্ছে। শোষণ করে নিতে চাইছে তাদের বাঁচার শেষ উপাদানটুকুও। এই উপনিবেশিক প্রভুরাই একদিন পবিত্র নদীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল রহুচণ্ডালের গোষ্ঠীকে। যে গোষ্ঠী এতদিন হাসত, গান গাইত, সম্পদ উৎপাদন করত তাদেরকে শক্তির, ক্ষমতার শক্তির, আধিপত্যের শক্তির জোরে দেশছাড়া করল তারা। এই আধিপত্যবাদী শক্তির কাছে সহজে হার মানলো না বাজিকরেরা। তারা

প্রতিবাদ করল, কিন্তু পরজিত হলো। কেননা ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি লাভ এতটা সহজ নয়।

এখানে লেখক আধিপত্যবাদীদের বর্ননায় একটি বিশেষ দিককে উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছেন। এই আধিপত্যবাদী প্রভুদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন– এরা শ্রমের নাম শুনলে অবাক হয়, কেননা তারা উৎপাদনের, সৃষ্টির ধার ধারে না, জানে শুধু খড়গের সাহায্যে হাসিল করতে। এই খড়গের সাহায্যেই তারা বাজিকরদের পরাজিত করে, বলপূর্বক বাজিকর রমণীদের ধর্ষণ করে, বাধাদানকারীদের হত্যা করে ফিরে যায়। পুনরায় ফিরে এসে মন্দির স্থাপন করে দেবতার, প্রতিষ্ঠা করে নতুন অনুশাসন, পবিত্র নদীর জলস্পর্শের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অচ্ছ্যুৎ বাজিকর জাতি। এখানে আমরা লক্ষ্য করি কিভাবে সমাজের ক্ষমতাবান আধিপত্যবাদী শ্রেণি আত্মসুখ চরিতার্থতার খাতিরে নিজেদের সমস্ত গ্লানি, কলুষতাকে ঢাকতে দেবতাকে ব্যবহার করছে। এই ঘটনাগুলিই তো আজকের বাস্তব। লেখক অভিজিৎ এভাবেই আধুনিক বাস্তবতার প্রকৃত রূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরছেন যা হয়ে উঠছে ঐতিহাসিক সময়ের এক তাৎপর্যপূর্ণ বিনির্মাণ। বিনির্মাণ মতাদর্শেরও।

আধিপত্যবাদী শক্তি দৈহিক পীড়ন এবং মগজ ধোলাই উভয় প্রক্রিয়ায়ই বাদিয়াদের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ চালিয়ে গেছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিকুলতার মধ্যেও বাজিকরেরা থেমে থাকেনি, এগিয়ে গেছে। এই এগিয়ে যাওয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক। তাদের থাকার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। এখানে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘‘অভিজিৎ সেনের হাড়তরঙ’’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। শ্রীযুক্ত ইলিয়াস অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ উপন্যাসটির নায়ক চরিত্র অন্বেষণের প্রয়াস চালিয়ে যা আবিষ্কার করলেন তা হলো -

“ ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ বইতে নায়ক পাওয়া গেলো, চোখের জল নাকের জলে গলে-যাওয়া মাংসপিণ্ডের প্রধান চরিত্র নয়, খট খটে হাড্ডির নায়ককে এখানে বেশ হাড়ে হাড়ে ঠাহর করা যায়। কিন্তু এই নায়ক কোন একজন ব্যক্তি নয়, সে ব্যক্তি নয়, একবচন নয়। সে হলো বহুবচন। তার নাম কি?

-নাম বাজিকর। বাজিকর। বাজিকর একটা গোষ্ঠী।

-নিবাস?

-তামাম দুনিয়া।’’ [২১]

উপনিবেশপ্রসুত আধুনিকতার ব্যক্তি সর্বস্বতার বাইরে এসে যে বাজিকর গোষ্ঠীর আখ্যান অভিজিৎ রচনা করলেন, তাতে এই গোষ্ঠীর নিবাস গোটা দুনিয়া জুড়ে। কারণ-

“ঘর নেই বলে দুনিয়া জুড়ে তার নিবাস।’’ [২২]

কিন্তু একদিন প্রকৃতই ছিল তাদের নির্দিষ্ট ঠিকানা। যদিও সেই অজ্ঞাত দেশ কোথায় তা আজ কেউ জানে না। এক শনিবারের ভূমিকম্পে জীর্ণ ঘরদোর ভেঙে গিয়ে, পালিত সব পশুরা মরে গিয়ে বাজিকরেরা বেঘর হয়। সেদিন থেকে তারা চলছে। প্রথমে উত্তরে উঠে তারপর ক্রমশ পূবের দিকে সরে আসছে তারা। উদ্দেশ্য স্থিতিলাভ কেননা পিতৃপুরুষ রহুর আদেশ, পূবের দিকেই তাদের স্থিতি। পূর্বপুরুষ রহু, দনুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় বৃদ্ধ দলপতি পীতেম।

“পীতেম হে, পীতেম, পূবের দেশে যাও, বাপ। সিথায় তুমার নসিব।’’ [২৩]

এই পূবের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্খা কেবল ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ এর চরিত্রদেরই নয়, এর স্রষ্টারও। পূব, পশ্চিমের বিপ্রতীপ, অর্থাৎ দেশীয়, যা আপনার নিজস্ব, অপরের অনুসৃত নয়। এই দেশজ, লোকজ উপাদানকেই তুলে আনতে হবে সাহিত্যের কেন্দ্রে। কারণ অভিজিৎ মনে করেন -

“..... লোককথা, লোককথার রং মিথের অলৌকিক বাস্তবতা - এসবের মধ্যেই

নতুন চিন্তা ও চেতনার সন্ধান হয়ত পাওয়া যাবে, ...” [২৪]

এই চিন্তা চেতনা সকল প্রকার ঔপনিবেশিকতা মুক্ত, প্রকৃত স্বাধীন রচনা। কিন্তু বাজিকরদের এই স্থিতি কবে, কোথায় হবে – তা বলা দুস্কর। কেননা বারে বারেই ভেঙে যাচ্ছে, বলা ভালো ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তাদের ঘর-দোর, দখল করা হচ্ছে তাদের পশু, ধর্ষিতা হচ্ছেন তাদের রমণীরা। বাজিকর ভুলে যাচ্ছে তার ভাষা, তার প্রকৃত উপার্জনের পন্থা। তারা মন দিচ্ছে কৃষিকর্মে। কেননা কৃষিকর্মের মধ্য দিয়েই স্থিতিলাভের সম্ভাবনা। কিন্তু চাষ করবে কোথায়? যাযাবরেরা জমি পাবে কোথায়? ফলে শরণাপন্ন হচ্ছে জোতদার, জমিমালিকদের। জমির পাট্টা কিনেও আইনি মার-প্যাচে হারাচ্ছে সেই জমির অধিকার। এই প্রতিটি বিষয়কেই অত্যন্ত বাস্তবিক অভিব্যক্তিতে উপন্যাসে হাজির করেছেন লেখক অভিজিৎ সেন।

উপন্যাসটিতে লেখক যে সময়ের বৃত্ত নির্মাণ করেছেন তাতে অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য চরিত্র জড়িয়ে গেছে। প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনা বহুমূখী বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে উপন্যাসে। পীতেম-লুবিনি-জামির-শারিবা,– সময়ে সময়ে কথক পাল্টে গেছে। এক এক জন কথকের দ্বারা একেক ভাবে উঠে এসেছে সমাজ বাস্তবের বহুবিচিত্র চলচ্ছবি। দনুর পুত্র পীতেম। সালমা দনুর কন্যা কি না এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। পেমা, পরতাপ, ধন্দু, ঝিল্লু ও বালি পীতেমের উত্তরাধিকারী। ধন্দুর ছেলে জামির, যার স্ত্রী লুবিনি। এই জামিরের পুত্র রূপা, যার ছেলে শারিবা। এই শারিবার বয়ানেই কাহিনির একটি বড় অংশ বিবৃত হয়েছে। এই চরিত্রগুলি বিভিন্ন চারিত্রিক গুণে বৈচিত্র্যময়। এরা কখনো স্থিতিলাভের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছে, কখনও ধর্মান্তরিত হয়ে বেঁচে থাকার লড়াই লড়ছে, কখনও নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাচ্ছে, আবার কখনও আধিপত্যবাদের বিপরীতে রুখে দাঁড়াচ্ছে। যদিও স্পষ্ট ভাবে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই নয়, লুকিয়ে ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে, কখনও তাদের আস্তাবল থেকে ঘোড়া চুরি করে নিয়ে।

তবে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট যে এই চরিত্রগুলি কখনই একাভিমুখী নয়। সময়ের সঙ্গে, ঘটনার সঙ্গে এরা পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেননা কোনো চরিত্রই সম্পূর্ণ 'সৎ' কিংবা 'অসৎ' হতে পারে না। এমন যখনই হয় তখনই মনে রাখতে হবে লেখকের নিজের ইচ্ছাপূরণের অভিপ্রায়টি এখানে জাড়িয়ে রয়েছে। তাই অভিজিৎ তার রচনায় দেখালেন চরিত্রের এই ধূসরতাই বাস্তব। বিকল্প আধুনিকতার পথের পথিক অভিজিৎ সেনের উপন্যাসে চরিত্রের এই বাস্তবিক গুণ একটি বিশেষ দিক। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কেবলমাত্র চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্রময়তা লেখকের অভিপ্রেত নয়। তাঁর উদ্দেশ্য একটি অবহেলিত, প্রান্তিকায়িত, শোষিত জাতির বেঁচে থাকার লড়াই এর আখ্যান নির্মাণ। তাই আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেছেন –

"অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' অপ্রত্যাশিতভাবে পাই ১৯৮৭ সালে, কলকাতা থেকে আমার বন্ধু দিলীপ পাঠিয়ে দিয়েছিল। পড়তে শুরু করতেই বইটি দারুণ মনোযোগ দাবী করলো, পড়তে হয়েছিলো আস্তে আস্তে। একটানা পড়বার মতো বই নয়, পাঠককে গ্রাহক ঠাউরে নিয়ে সেঁটে রাখার ফন্দি এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। পড়তে পড়তে কাহিনীর সঙ্গে একাকার হয়ে যাওয়া এখানে অসম্ভব, বরং বইটিকে যত্নের সঙ্গে অনুসরণ করতে হয়। এদিকে প্রধান চরিত্রের নামও বারবার ভুলে যাচ্ছিলাম, তাকে খুঁজতে একটু কষ্টই হচ্ছিলো? পরে বুঝতে পারি প্রধান চরিত্র বলতে যা বোঝার সেরকম একজন পুরুষ বা একজন মহিলা এখানে খোঁজা নিরর্থক। না, নায়ক খুঁজিনি।'' [২৫]

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাস বারবার দেখি বাজিকরদের একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তাদের জাত কী? হিন্দু না মুসলমান? এই প্রশ্ন উঠেছে তাদের বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে, তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে, তাদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে। কিন্তু এর উত্তর বাজিকর দিতে পারে নি। কেননা তারা হিন্দু বা মুসলমান কিছুই নয়। একদিকে যেমন

তারা গরু ও শুয়োর দুই-ই খায়, অন্যদিকে আবার কিছু কিছু দেব-দেবীও মানে, যেমন - বিগামাই, কালীমাই, উলামাই– এই দেবতারাও তাদের পথের সংগ্রহ। আর এই ধর্মহীনতাই তাদের বারবার ঠিকানা পালটানোর কারণ হয়ে যায়। ইয়াসিন ও রূপার জমি বেহাত হয়ে যায়। কিন্তু এই বাজিকরেরাই যখন থিতু হওয়ার প্রবল বাসনায় ধর্মদীক্ষা নেয়, তখন সেখানেও তাদের ঠকতে হয়। ইয়সিন বাজিকরের বক্তব্যটি উল্লেখ্য–

"বাপ যেমন ছিলাম তেমনই আছি। ..... হামরা পাখমারা আর বেদিয়া মোছলমানের মতোই বেজাত মোছলমান হোই গেলাম।..... হাজিসাহেব কহেন, পাঁচ ওয়াক্‌ত নামাজ পড়ো, ... জাতে উঠবা। তা বাপ, সবই তো করি, কেন্তু জাতে তো উঠি না।''। [২৬]

অর্থাৎ ধর্মের পরিচয়ও সাধারণ মানুষকে মর্যাদা দিতে পারে না। কেননা মর্যাদা, সম্মান ইত্যাদি বিষয় কিছু অভিজাত লোকের স্বার্থেই গড়ে ওঠে। তাই বাজিকর যাযাবরদের প্রবহমান দেড়শো বছরের ইতিহাস বর্ণনায় যে শেষ বাজিকরকে আমরা দেখি সেই শারিবা কেনো ধর্মে নিজেকে জড়াতে চায় না। সে তার আদিপুরুষের মান্যতাগুলিকেই যেন মনে মনে বিশ্বাস করে।

"এখন তার মনে হয় এদের সবার মতো সেও হয়তো এক সময় রহুকে দেখতে শুরু করবে।'' [২৭]

বিষন্ন মুর্তিতে রহু তাকে বলবে,

" ..... তুমি কে?

- আমি শারিবা।

- শারিবা কে?

- শারিবা বাজিকর।

- তবে তো তোমার খুব দুঃখ

শারিবা বলবে, হ্যাঁ আমার বড় দুঃখ, আমার দুঃখের অসান নেই।'' [২৮]

কিন্তু এই দুঃখে মজে পড়ে থাকলেই চলবে না। তাই সে এগোনোর প্রচেষ্টা করে। গ্যারেজ শ্রমিকের কাজ করে সে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে সে পিছিয়ে পড়ে না। এগিয়ে যায়, পুরাতনকে সঙ্গে নিয়ে। এই প্রচেষ্টাকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা মানতে চায় নি। শুধু বর্তমান, শুধু ব্যক্তিসর্বস্বতাই ছিল তাদের অভিপ্রেত। কিন্তু এই ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে অতীতকে স্বীকার করে বর্তমানকে সঙ্গে নিযে ভবিষ্যতের দিকে। এই ধারণাকেই উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে লেখক অভিজিৎ সেন। যেখানে কেনো ধর্ম, কোন নির্ভরতা কাম্য নয়,- কাম্য হলো কেবল বেঁচে থাকা। আর এই বেঁচে থাকার লড়াই-ই নানাভাবে ফুটে উঠেছে উপন্যাসের গোটা পরিধি জুড়ে।

'রহু চণ্ডালের হাড়' একটি জাতির আত্মঅনুসন্ধানের নিবিড় আলেখ্য বা বাজিকর নামক একটি ছিন্নমূল সম্প্রদায়ের ছবি যেখানে অস্তিত্বের সংকট, জাতিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভাঁজে ভাঁজে নৃশংস হত্যা, নির্বিচার লুণ্ঠন ও অবাধ যৌন লাঞ্ছনার অসংখ্য কালো গহ্বর গতির সাক্ষ্য হয়ে আছে। একটি দ্বন্দ্ব বাজিকর জাতিতে চির তাড়া করেছে, তা হলো গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব। বাজিকরদের মধ্যে স্থায়ী বসতি স্থাপনের আকর্ষণ তীব্র। এই তীব্র আকর্ষণের সাথে ওদের আভ্যন্তরীণ চলিষ্ণু উষ্ণ রক্তধারার প্রতিনিয়তই বেঁধেছে সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব। গার্হস্থ্য জীবনে স্থায়ী হওয়ার জন্য মাটির সাথে যে সংযোগ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা বাজিকর সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপস্থিত। উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে বাজিকরদের আজন্ম বেদুইন বৃত্তি ছেড়ে কৃষি কৃষ্টিতে স্থিত করানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে পীতেমের অনেকটা আত্মতৃপ্তি যেমন আছে, তেমনি দনু ও রহুর দর্শন ও তাদের আহ্বানের মধ্যে আকাঙ্খামিশ্রিত ভীতিও রয়েছে।

অনভ্যস্ত বাজিকর গৃহস্থালীর কোন কাজ ভালো করে করতে জানে না। হাজার বছরের কর্মহীন উদ্যোগহীন হাতে কোন কাজই ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না। মূলত 'ভিখমাঙ্গা'র নাম ঘোচাতেই বাজিকরদের এই দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা। এখন প্রশ্ন হলো এই 'ভিখমাঙ্গা' নাম ঘোচানোর এত কঠিন প্রচেষ্টা কেন? বাজিকরদের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের নির্দিষ্ট কিছু কাজ আছে, যেমন দড়ির ওপর খেলা দেখানো, নানা রকমের মনোরঞ্জন করা, নানান জড়িবুটি বিক্রি করা, হাত দেখা– এসবে বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, নির্দিষ্ট কিছু ছলচাতুরী আছে। কিন্তু এগুলোকে 'ভিখমাঙ্গা' অভিধায় সাজিয়ে এর থেকে বেরিয়ে আসলেই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা– এমন চিন্তার মধ্যেও এক ধরনের ঔপনিবেশিকতা রয়েছে। ঔপনিবেশিকতা কেবল একটি জাতির ওপর অন্য একটি জাতির জবর দখল এমন নয়। চিন্তা ভাবনার দ্বারাও স্থাপন করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায়ও একটি জাতি শোষিত হতে পারে। এই শোষণের স্বাক্ষরই 'রহু চণ্ডালের হাড়' এই উপন্যাসটি। যদিও এই শোষণের দিকটা উপন্যাস তেমন গুরুত্ব পায়নি। উপন্যাসটি প্রধানত সমাজের অবজ্ঞাত একটি সম্প্রদায়ের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি -কান্না প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, পাওয়া - না পাওয়ার যন্ত্রণার আখ্যান হিসেবেই মান্যতা পেয়েছে।

*****

<u>উল্লেখপঞ্জী ঃ-</u>

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'কালান্তর' এ এধরনের মন্তব্য করেছেন।

২। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য তপোধীর ভট্টাচার্যের প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, মেদিনীপুর ১৯৯৭

৩। Edward. W. Said: 'Orientalism', 1978, http.saidorientalismintroduction.pdf.

৪। সেন, অভিজিৎ ঃ 'রহু চণ্ডালের হাড়', ভূমিকা, সুবর্নরেখা, কলকাতা, ১৯৮৫।

৫। সেন, অভিজিৎ ঃ 'বাংলা সাহিত্যের গড়পড়তা লেখকদের পড়বার সময় কোথায়?' শীর্ষক বিকাশ শীল সম্পাদিত 'জনপদপ্রয়াস', বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৬, সংখ্যা প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা– ২৯।

৬। সেন, অভিজিৎ ঃ 'রহু চণ্ডালের হাড়', জে. এন. চক্রবর্ত্তী এন্ড কোং, ডিসেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা– ২১।

৭। ঐ, পৃষ্ঠা– ২১।

৮। ঐ, পৃষ্ঠা– ৮।

৯। ঐ, পৃষ্ঠা– ৮।

১০। ঐ, পৃষ্ঠা– ১২।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৫।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা– ২১০।

১৩। 'বাংলা সাহিত্যের গড়পড়তা লেখকদের পড়বার সময় কোথায়?' শীর্ষক ক্রোড়পত্র, নিসর্গ ৯ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত উত্তর আধুনিক কবিতা আন্দোলনের প্রবক্তা কবি প্রাবন্ধিক অঞ্জন সেনের সাথে লেখক অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকারের অংশ, পৃষ্ঠা– ১৬৬।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৬৬, ১৬৭।

১৫। শিল্পভাষা একাডেমির পক্ষ থেকে নেওয়া ভগীরথ মিশ্রের সাক্ষাৎকার, 'শিল্পভাষা' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, পৃষ্ঠা– ৪৬।

১৬। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য দেবেশ রায়ের, 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে কলকাতা ১৯৯৪।

১৭। সেন, অভিজিৎ ঃ 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা', ক্রোড়পত্র- নিসর্গ, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা– ১৮৪।

১৮। 'বাংলা সাহিত্যের গড়পড়তা লেখকদের পড়বার সময় কোথায়?' শীর্ষক ক্রোড়পত্র, নিসর্গ ৯ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত উত্তর আধুনিক কবিতা আন্দোলনের প্রবক্তা কবি প্রাবন্ধিক অঞ্জন সেনের সাথে লেখক অভিজিৎ সেনের সাক্ষাৎকারের অংশ, পৃষ্ঠা– ১৬৬।

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৬৫।

২০। ঐ, পৃষ্ঠা– ১৬৬।

২১। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'অভিজিৎ সেনের হাড় তরঙা', ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা– ২১০।

২২। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১০।

২৩। সেন, অভিজিৎ ঃ 'রহু চণ্ডালের হাড়', জে. এন. চক্রবর্ত্তী এন্ড কোং, ডিসেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা– ২৬।

২৪। উদ্ধৃত, ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'উপন্যাসের প্রতিবেদন' কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা– ১৭৫।

২৫। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, 'অভিজিৎ সেনের হাড় তরঙা', ক্রোড়পত্র, নিসর্গ, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা– ২০৯।

২৬। সেন, অভিজিৎ ঃ 'রহু চণ্ডালের হাড়', জে. এন. চক্রবর্ত্তী এন্ড কোং, ডিসেম্বর, ২০১০, পৃষ্ঠা– ২৬২।

২৭। ঐ, পৃষ্ঠা– ২৬৩।

২৮। ঐ, পৃষ্ঠা– ২৬৩, ২৬৪।

*****